কালের কণ্ঠ

তারিখ 24 SEP 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

প্রাথমিক শিক্ষার করুণ দশা

সরকারের পক্ষ থেকে নানা সুবিধা দেওয়ার পরও দেশে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার দশা করুণ। অনিয়ম-দুর্নীতির মাধ্যমে শিক্ষক হিসেবে ঢুকে যাচ্ছেন কম মেধাবীরা। যথাযথ প্রশিক্ষণও নেই অনেকের। প্রশিক্ষিত প্রাথমিক শিক্ষকদের হিসাবে দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে পিছিয়ে বাংলাদেশ। নজরদারিতেও গাছাড়া ভাব রয়েছে শিক্ষা প্রশাসনের। শিক্ষকরাও তাঁদের সন্তানদের সরকারি প্রাথমিক স্কুলে পড়ান না

টাকা ঢেলে শিক্ষক

শরীফ আহ্‌মেদ শামীম, গাজীপুর ▷

কালের কণ্ঠ অনুসন্ধান

- জালিয়াতির মাধ্যমে চাকরি পাচ্ছে অমেধাবীরা
- ব্যবহার হচ্ছে বিভিন্ন কোটার জাল সনদ
- শূন্য থেকে ধনকুবের উচ্চমান সহকারী হারুন মল্লিক

১৯৮৭ সালে বিয়ের সময় আসমা হেনা পড়তেন সপ্তম শ্রেণিতে। আট বছর পর দুবারের চেষ্টায় ১৯৯৫ সালে দ্বিতীয় বিভাগে এসএসসি পাস করেন তিনি। তাঁর ছোট বোন হাসনা হেনা ১৯৯৮ সালে এসএসসি পরীক্ষায় ফেল করার পর গৃহকর্মীর চাকরি নিয়ে দুবাই যান। ২০০১ সালে দেশে ফিরে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাস করেন তিনি। তবে এসএসসি পরীক্ষায় টেনেটুনে পাস করলেও ২০০৬ সালে একবারের চেষ্টায়ই প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষায় উতরে গেছেন দুই বোন। তাঁদের আরেক বোন হোসনা হেনা সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার পর ছোট বোন হাসনা হেনার সঙ্গেই দুবাই গিয়েছিলেন। দেশে ফিরে তিনিও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাস করেন ২০১২ সালে। পরের বছর তিনিও প্রথমবার নিয়োগ পরীক্ষা দিয়েই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেয়ে যান।

শিক্ষাজীবনে প্রতিভার ঝলক না থাকলেও তিন বোন প্রথমবার নিয়োগ পরীক্ষা দিয়েই কিভাবে উতরে গেলেন—এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে কালের কণ্ঠ'র অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে বিস্ময়কর তথ্য। সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে, আসমা হেনার স্বামী হারুন মল্লিকের কারসাজিতেই তিন বোনের চাকরি হয়েছে। হারুন গাজীপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের উচ্চমান সহকারী। সহকর্মী ও স্থানীয়দের ভাষ্যমতে, টাকা পেলে নিয়োগ-বদলিসহ অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন তিনি।

শুধু আসমারা তিন বোন নন, অনুসন্ধানে দেখা গেছে, শিক্ষাজীবনে নামমাত্র পাস করা অসংখ্য প্রার্থীকে গত কয়েক বছরে অনিয়মের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের চাকরি পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। নিয়োগের লিখিত পরীক্ষায় জালিয়াতির পাশাপাশি জাল সনদ দিয়ে এতিম, আনসার-ভিডিপি ও প্রতিবন্ধী কোটায় প্রার্থীদের চাকরি হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, বেশির ভাগ নিয়োগের পেছনেই জালিয়াতির কলকাঠি নেড়েছেন হারুন।

আসমা হেনার বাড়ি ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলার নিওয়ারীর কান্দলিরটেক গ্রামে। হারুন মল্লিকের বাড়ি গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার বাপতা গ্রামে। আসমার ভাষ্য অনুযায়ী, তাঁর জন্ম ১৯৭৯ সালের ১৫ অক্টোবর। ১৯৮৭ সালে বিয়ের সময় তিনি ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ের নিওয়ারী হাই স্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী ছিলেন। বিয়ের দুই বছর পর ১৯৮৯ সালে তাঁদের বড় মেয়ের জন্ম হয়। ১৯৯৫ সালে ময়মনসিংহের ফুলপুর থেকে এসএসসি পাস করেন তিনি (আসমা)। সে অনুযায়ী, মাত্র এক বছর বয়সে তিনি প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হন, আট বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয় এবং ১০ বছরে তিনি সন্তানের মা হয়েছেন। এ ছাড়া বিয়ের আট বছর পর এসএসসি পাস ও পাসের ১১ বছর পর নিয়োগ পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পেয়েছেন।

চাকরি পাওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে আসমা বলেন, 'বুঝতেই পারছেন, আমাদের তিন বোনের চাকরির ব্যবস্থা আমার সাহেবই করেছেন।' তবে

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ১

টাকা ঢেলে শিক্ষক

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

মাত্র এক বছর বয়সে কিভাবে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিলেন—এ বিষয়ে বারবার জানতে চাইলেও কোনো উত্তর দেননি তিনি।

শ্রীপুরের বরমী গ্রামের কয়েকজন বাসিন্দা জানান, হারুন মল্লিকের দুই শ্যালিকাই (হাসনা ও হোসনা) গফরগাঁওয়ের বাসিন্দা। তাঁরা শ্রীপুরের বরমীর বাসিন্দা পরিচয়ে গাজীপুরের কোটায় প্রাথমিক শিক্ষক পদে আবেদন করে চাকরি নিয়েছেন। চাকরিতে যোগ দেওয়ার পর বরমীতে জমি কিনে বাড়ি করেছেন।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ২০১৩ সালে প্রাথমিক শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন হারুন মল্লিকের শ্বশুরবাড়ির দিকের আত্মীয় নাজমা খাতুন। এখন তিনি শ্রীপুর মাওনা চৌরাস্তা সংলগ্ন তেলিহাটি ইউনিয়নের মুলাইদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। তাঁর বাড়ি গফরগাঁওয়ের তলল্লী গ্রামে। মুলাইদ গ্রামের বাসিন্দা পরিচয়ে আবেদন করে চাকরি নিয়েছেন নাজমা। এভাবে গফরগাঁওয়ের অনেক প্রার্থীকে গাজীপুরের বাসিন্দা দেখিয়ে চাকরি নিয়ে দিয়েছেন হারুন মল্লিক।

শ্রীপুরের বিভিন্ন স্কুলের কয়েকজন প্রাথমিক শিক্ষক জানান, ২০০৬ সালে নিয়োগ পাওয়ার পর আসমা হেনা শ্রীপুরের নান্দিয়া সাঙ্গুন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ও হাসনা হেনা বরমী ইউনিয়ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যোগ দেন। চাকরির কারণে হারুন মল্লিক গাজীপুর সদরে বাস করেন। হাসনা হেনার স্বামী টঙ্গীতে একটি গার্মেন্টে চাকরি করেন। যাতায়াত সমস্যার কারণে হারুন মল্লিক প্রভাব খাটিয়ে গত বছরের জুনে প্রেষণে (ডেপুটেশনে) স্ত্রীকে বাসার কাছের গাজীপুর মহানগরীর উত্তর খাইলকুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শ্যালিকা হাসনা হেনাকে টঙ্গীর গাজীপুরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বদলি করান।

প্রাথমিক স্কুলের বদলির নীতিমালা অনুযায়ী, কোনো স্কুলে শিক্ষক বেশি থাকলে ও কোনো স্কুলে শিক্ষক ঘাটতির কারণে লেখাপড়ার পরিবেশ বিঘ্নিত হলেই শুধু বেশি শিক্ষক রয়েছে এমন স্কুল থেকে অন্য স্কুলে (কম শিক্ষক রয়েছে যেখানে) প্রেষণে যাওয়া যায়। আসমা হেনা ও হাসনা হেনার বেলায় সে নিয়ম মানা হয়নি। হারুন মল্লিকের দুর্নীতি তুলে ধরে আরেক শিক্ষক বলেন, ২০১৩ সালের ১৮ নভেম্বর প্রাক প্রাথমিক শিক্ষক পদে শ্রীপুর উপজেলা থেকে ৫১ জন নিয়োগ পান। তাঁদের মধ্যে ৩৭ জনই ছিলেন 'হারুন মল্লিকের প্রার্থী'। তাঁদের মধ্যে ২১ জন সাধারণ, চারজন পোষ্য, ছয়জন মুক্তিযোদ্ধা, তিনজন আনসার-ভিডিপি, দুজন প্রতিবন্ধী ও একজন উপজাতি কোটায় নিয়োগ পেয়েছেন। তাঁদের মধ্যে হারুন মল্লিকের বড় শ্যালিকা হোসনা হেনা, ভাতিজি আফরোজা সুলতানা, মামাত বোন রোজিনা আক্তার, বন্ধুর বড় ভাইয়ের মেয়ে জেসমিন আক্তার শান্তা ছাড়াও নিজ গ্রাম বাপতা থেকে তিনজন, পাশের নান্দিয়া সাঙ্গুন গ্রামের পাচজন ও আশপাশের কয়েক গ্রামের আরো ১০ জন রয়েছেন।

বাপতা গ্রামের অবসরপ্রাপ্ত এক প্রাথমিক শিক্ষক নাম না প্রকাশের শর্তে বলেন, 'এত দিন শুনেছি মেধা থাক আর না থাক, সার্টিফিকেট থাকলে হারুন মোল্লার কাছে গেলে চাকরি হয়। রোজিনা আক্তারকে না দেখলে হয়তো সে কথা বিশ্বাস হতো না।' ওই প্রবীণ শিক্ষক জানান, ১৯৯৮ সালে দশম শ্রেণিতে পড়ার সময় বাপতা গ্রামের আব্দুস ছোবানের মেয়ে রোজিনার বিয়ে হয় গফরগাঁওয়ের গয়েশপুরে। স্বামী গয়েশপুর কলেজের প্রদর্শক। বাপতা হাই স্কুল থেকে ১৯৯৯ ও ২০০০ সালে এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে দুবারই ফেল করেন রোজিনা। ২০০১ সালে কোনো রকমে পাস করে ভর্তি হন স্বামীর কলেজে। ২০০৩ সালে এইচএসসি পরীক্ষা দিয়ে চার বিষয়ে ফেল করেন। পরে ভর্তি হন বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাউবি) গফরগাঁওয়ের কান্দিপাড়া টিউটোরিয়াল কেন্দ্রে। সেখান থেকেও একবার ফেল করেন। পরে গফরগাঁওয়ের রৌহা কারিগরি স্কুল থেকে ২০০৮ সালে তিনি এইচএসসি পাস করে করেন। অথচ সেই রোজিনা ২০১৩ সালে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় অংশ নিয়ে প্রায় ১২ হাজার প্রার্থীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে প্রথমবারেই লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। বর্তমানে তিনি শ্রীপুরের কেওয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষিকা।

সনদ জাল করে চাকরি নিয়েছেন হারুন মল্লিকের ভাতিজি আফরোজা সুলতানাও। পরিবার, আত্মীয়স্বজন, স্কুলের শিক্ষক ও সহপাঠীরা তাঁকে সুস্থ-স্বাভাবিক হিসেবেই জানেন। অথচ গাজীপুর জেলা সমাজসেবা বিভাগের সনদ অনুযায়ী আফরোজা শ্রবণ প্রতিবন্ধী। ২০১৩ সালে শ্রবণ প্রতিবন্ধী কোটায় নিয়োগ পেয়ে তিনি এখন স্বামীর বাড়ির কাছে শ্রীপুরের সাতখামাইর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা। আফরোজা দাবি করেন, অষ্টম শ্রেণিতে পড়ার সময় ২০০৫ সালে তাঁর বিয়ে হয়। বিয়ের সাত বছর পর ২০১২ সালে তিনি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীপুর পাইলট হাই স্কুলের কেন্দ্র থেকে এসএসসি পাস করেন। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় পাস করেই তিনি শিক্ষকের চাকরি পেয়েছেন।

আফরোজা শ্রবণ প্রতিবন্ধী—এমন কথা শুনে বিস্মিত শ্রীপুর পাইলট হাই স্কুলের উন্মুক্ত শাখার শিক্ষকরাও। ওই স্কুলের উন্মুক্ত শাখার ইনচার্জ আক্তার হোসেন বলেন, আফরোজা শ্রবণ প্রতিবন্ধী নন, তবে তিনি খুবই দুর্বল ছাত্রী ছিলেন। সাতখামাইর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আফরোজার সহকর্মী ও শিক্ষার্থীরাও জানান, আফরোজা শ্রবণ প্রতিবন্ধী নন।

হারুন মল্লিকের হাত ধরে শারীরিক প্রতিবন্ধী কোটায় নিয়োগ পেয়েছেন শ্রীপুর উপজেলার ভিটিপাড়া গ্রামের আবদুস ছাত্তারের ছেলে সোহেল মিয়া। তিনি বর্তমানে ভিটিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক। তবে এলাকার লোকজন জানান, সোহেল প্রতিবন্ধী নন।

শ্রীপুর উপজেলার সদ্যবিদায়ী সমাজসেবা কর্মকর্তা শংকর শরণ সাহা জানান, প্রতিবন্ধী সনদ জেলা সমাজসেবা অফিস থেকে দেওয়া হয়। তবে উপজেলা সমাজসেবা অফিস থেকে সনদের জন্যে জেলায় সুপারিশ পাঠাতে হয়। রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে তিনি জানান, গত কয়েক বছরের মধ্যে আফরোজা সুলতানা বা সোহেল মিয়া নামের কারো সনদের জন্য নাম জেলায় পাঠানো হয়নি। জেলা অফিস থেকে ওই দুজনকে কিভাবে সনদ দেওয়া হয়েছে জানা নেই।

স্কুল জীবনে কয়েকবার পরীক্ষা দিয়েও এসএসসি পাস করতে পারেননি শ্রীপুরের সোনাকর গ্রামের লিয়াকত আলীর মেয়ে নাঈমা আক্তার তৃষা। বিয়ের ছয় বছর পর তিনি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাস করেন। হারুন মল্লিকের হাত ধরে তিনিও প্রাথমিক শিক্ষক পদে নিয়োগ পেয়েছেন ২০১৩ সালে। একই বছর আনসার-ভিডিপি কোটায় প্রাথমিক শিক্ষক পদে নিয়োগ পেয়েছেন সোনাকর গ্রামের আবদুর রউফের মেয়ে ফারজানা আরমিন, নান্দিয়া সাঙ্গুন গ্রামের বদর উদ্দিনের মেয়ে বদরুন নাহার, শ্রীপুর পৌরসভার উজিলাব এলাকার হানিফ মিয়ার ছেলে এখলাস উদ্দিন। যদিও স্থানীয় আনসার-ভিডিপি দলনেতা-নেত্রীদের কেউ তাঁদের চেনেন না।

বরমী ইউনিয়ন আনসার-ভিডিপি কমান্ডার সৈয়দ হোসেন জানান, ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে তিনি দায়িত্ব পালন করছেন। প্রশিক্ষণের জন্য প্রার্থীদের প্রাথমিক বাছাই তিনিই করেন। ফারজানা আরমিন নামে সোনাকর গ্রামের কেউ প্রশিক্ষণ নেননি। একই কথা জানান শ্রীপুর পৌর আনসার-ভিডিপি কমান্ডার মো. বিল্লাল হোসেন। তাঁদের ভাষ্যমতে, জাল সনদ দিয়ে প্রভাবশালীরা আনসার-ভিডিপি কোটায় চাকরি নিচ্ছেন।

শ্রীপুরের একাধিক প্রাথমিক শিক্ষক নেতা জানান, ২০০১ সালে হারুন মল্লিকের মাধ্যমে আনসার-ভিডিপি কোটায় নিয়োগ পাওয়া ১১ জনের বিরুদ্ধে জাল সনদ দিয়ে চাকরি নেওয়ার অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ পেয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের নির্দেশে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শ্রীপুরের বিধাই গ্রামের আবু নাঈম, বাপতা গ্রামের হাসনা হেনা ও তাসমিয়া সুলতানা, বেলদিয়া গ্রামের সুমি আক্তার, কালিয়াকৈরের বাঘাইর গ্রামের লিলি আক্তার, মহিষবাথান গ্রামের হারুন অর রশিদসহ ১১ জনের সনদ যাচাইয়ের জন্যে আনসার-ভিডিপি সদর দপ্তরে চিঠি পাঠান। পরে আনসার সদর দপ্তর থেকে চিঠি দিয়ে জানানো হয়, ওই ১১ জনের সনদ জাল। চিঠি পেয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ওই ১১ জনের নিয়োগ স্থগিত করে বেতন বন্ধ করে দেয়। ওই ১১ শিক্ষক টাকা ফেরত চেয়ে মামলার হুমকি দেন হারুন মল্লিককে। ছয় মাস পর হারুন মল্লিক আনসার সদর দপ্তর থেকে 'সনদ সঠিক' উল্লেখ করে আরেকটি চিঠি এনে তাঁদের পুনর্বহালের ব্যবস্থা করেন। যদিও অনেক মনে করেন, আনসার সদরের পরের চিঠিটিও জাল। তাঁদের মতে, আনসার সদর দপ্তরের নির্দেশে গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা আনসার-ভিডিপি অফিস থেকে তদন্ত প্রতিবেদন পেয়ে 'সনদ সঠিক নয়' উল্লেখ করে চিঠি দেন আনসার সদর দপ্তরের পরিচালক (অঙ্গীভূত) পবিত্র কুমার সাহা। একই ব্যক্তির ছয় মাসের মধ্যে 'সনদ সঠিক' বলে চিঠি দেওয়ার ঘটনা বিশ্বাসযোগ্য নয়। ওই ১১ জনের মধ্যে হাসনা হেনা ও তাসমিয়া সুলতানা, বেলদিয়া গ্রামের সুমি আক্তার হারুন মল্লিকের আত্মীয়। আবু নাঈম চাকরিপ্রার্থী সংগ্রহ করে দেওয়ার দালাল হিসেবে এলাকায় পরিচিত।

জানা গেছে, শ্রীপুরের কাওরাইদ ইউনিয়ন আনসার-ভিডিপি দলনেতা মো. তাইজউদ্দিন ও হারুন মল্লিকের বাড়ি কাওরাইদ ইউনিয়নের বাপতা গ্রামে। আগে হারুন মল্লিক তাইজউদ্দিনের মাধ্যমে জাল সনদ জোগাড় করে দুর্বল ছাত্রীদের আনসার-ভিডিপি কোটায় চাকরির ব্যবস্থা করতেন। বিষয়টি জানাজানি হলে কৌশল পরিবর্তন করেন। এখন তাইজউদ্দিনের মাধ্যমে প্রার্থীদের আনসার-ভিডিপির প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রথমে সনদ সংগ্রহ করেন। পরে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হলে ওই কোটায় আবেদন করান।

তবে অভিযোগ অস্বীকার করে তাইজউদ্দিন জানান, ২০০১ সালে নিয়োগ পাওয়া বাপতা গ্রামের হাসনা হেনার আনসার-ভিডিপি সনদ সঠিক নয়। নান্দিয়া সাঙ্গুন গ্রামের বদরুন নাহার, বিধাই গ্রামের আবু নাঈম ও তাসমিয়া সুলতানা ও বেলদিয়া গ্রামের সুমি আক্তার মানিকগঞ্জ ও নরসিংদীতে ভিডিপির মৌলিক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। তবে তাঁরা এলাকায় কোনো দিন ভিডিপির কোনো কাজে সম্পৃক্ত ছিলেন না।

শ্রীপুর উপজেলা আনসার-ভিডিপি কর্মকর্তা আবদুল মোতালেব ও কালিয়াকৈর আনসার-ভিডিপি কর্মকর্তা আমিনুজ্জামান রনি কালের কণ্ঠকে জানান, আনসার-ভিডিপি কোটায় ২০১৩ সালে নিয়োগ পাওয়া ফারজানা আরমিন, বদরুন নাহার ও এখলাস উদ্দিন এবং ২০০১ সালে নিয়োগ পাওয়া ওই ১১ জনের নাম তাঁদের রেজিস্টারে নেই।

গাজীপুর জেলা আনসার-ভিডিপি কর্মকর্তা ড. সাইফুর রহমান জানান, কারো সনদ সঠিক না জাল, তা যাচাই না করে বলা যাবে না। সনদ যাচাইয়ের কোনো চিঠি তিনি এ পর্যন্ত পাননি।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, একের পর এক মানহীন শিক্ষক নিয়োগ পাওয়ায় গাজীপুরের শ্রীপুরে প্রাথমিক শিক্ষার মান দিন দিন নিচের দিকে নামছে। এ নিয়ে হারুন মল্লিকের ওপর ক্ষুব্ধ শ্রীপুরের অধিকাংশ প্রাথমিক শিক্ষক। হারুন মল্লিক প্রভাবশালী হওয়ায় তাঁরা প্রকাশ্যে প্রতিবাদও করতে পারছেন না।

বাপতা গ্রামের বাসিন্দা ব্যবসায়ী ইলিয়াস হোসেন তাঁর দুই সন্তানকে আট কিলোমিটার দূরে বরমীতে একটি বেসরকারি স্কুলে ভর্তি করিয়েছেন। তিনি বললেন, 'গ্রামে দুটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। তার পরও অনেক অভিভাবক সন্তানদের সরকারি প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি না করিয়ে দূরের কিন্ডারগার্টেনে ভর্তি করিয়েছেন। কারণ সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের বেশির ভাগই কয়েক দফা ফেল করে পরে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরি স্কুল কিংবা মাদ্রাসা থেকে পাস করেছেন। তাঁরা ক্লাসে ভালোভাবে শিশুদের পাঠদান করতে পারেন না। অনেকে সাধারণ ইংরেজি-অঙ্কও ভুল শেখান।

শূন্য থেকে অগাধ সম্পদের মালিক হারুন মল্লিক : ২০০৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে গাজীপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে উচ্চমান সহকারী হিসেবে যোগ দেন হারুন মল্লিক। যোগ দিয়েই জড়িয়ে পড়েন নিয়োগ বাণিজ্যে। গত ১০ বছরে তাঁর হাত ধরে সহস্রাধিক প্রার্থী চাকরি পেয়েছেন। লিখিত পরীক্ষায় জালিয়াতি এবং জাল সনদে এতিম, আনসার ও প্রতিবন্ধী কোটায় অধিকাংশ চাকরি দেওয়া হয়েছে। চাকরি পাওয়া শিক্ষকদের বেশির ভাগই কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নামমাত্র পাস করা। এই নিয়োগ বাণিজ্যের মাধ্যমে শূন্য থেকে অগাধ সম্পদের মালিক হয়েছেন হারুন মল্লিক। অনুসন্ধানে জানা গেছে, গাজীপুর মহানগরীর বোর্ড বাজার বটতলা সড়কের মৃধা বাড়ির কাছে জমি কিনে পাঁচতলা বাড়ি করেছেন হারুন মল্লিক। গাজীপুরে তাঁর রয়েছে একাধিক প্লট। শ্রীপুর পৌরসভার মাওনা চৌরাস্তার কেওয়া পশ্চিমখণ্ড এলাকার দারগারচালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাছে চার কাঠা, মাওনার মুলাইদে শ্রীপুর উপজেলা চেয়ারম্যান আবদুল জলিলের বাড়ির দক্ষিণে তিন কাঠার প্লট এবং গ্রামের বাড়িতে রয়েছে বিস্তর কৃষিজমি।

চাকরিপ্রার্থী পরিচয় দিয়ে কথা হয় হারুন মল্লিকের চাচা ইন্তাজ উদ্দিন মল্লিকের সঙ্গে। তিনি বলেন, 'হারুন শত শত ছেলেমেয়েকে চাকরি দিয়েছে। টাকা নিয়ে কাজ করতে পারেনি, এমন কথা শত্রুও বলতে পারবে না। আপনি নিশ্চিন্তে টাকা দেন।'

হারুন মল্লিকের সহপাঠী নান্দিয়া সাঙ্গুন গ্রামের জসিম উদ্দীন মীর বলেন, 'চাকরি পায় বলেই মানুষ তার (হারুন মল্লিক) কাছে যায়। স্কুল-কলেজের পরীক্ষায় ফেল করা অনেক ছেলেমেয়েকে সে চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এটাকে দোষ না ধরে গুণ হিসেবে দেখা প্রয়োজন।'

হারুন মল্লিকের ঘনিষ্ঠরা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, আগে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের আবেদনপত্র বাছাই, প্রবেশপত্র ইস্যু, আসন ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি দেখভাল করত জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস। উচ্চমান সহকারী হিসেবে এসব কাজের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ছিল হারুন মল্লিকের কাছে। পরীক্ষাকেন্দ্রের সচিব-পরিদর্শক সবাই থাকতেন তাঁর হাত করা। তাঁর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা নির্দিষ্ট কক্ষে 'বিশেষ ব্যবস্থা'য় নেওয়া হয়। প্রয়োজনে প্রবেশপত্রের ছবি পাল্টে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেধাবী ছাত্রদের এনে পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন হারুন মল্লিক। যে কারণে তাঁর প্রার্থীরা সহজেই লিখিত পরীক্ষায় বেশি নম্বর পেয়ে পাস করেন। ফলে মৌখিক পরীক্ষায় কম নম্বর পেলেও তারা চাকরি পেয়ে যায়।

তা ছাড়া মুক্তিযোদ্ধা ও পোষ্য কোটায় প্রার্থী পাওয়া গেলেও আনসার-ভিডিপি, প্রতিবন্ধী, এতিম ও উপজাতি কোটায় প্রার্থী পাওয়া যায় না। হারুন মল্লিক প্রার্থীদের সঙ্গে চুক্তি করে প্রথমে ওইসব কোটায় সনদ সংগ্রহ করেন। পরে তাঁর প্রার্থীদের ওইসব কোটায় নিয়োগ পাইয়ে দেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন শিক্ষক জানান, ২০১৫ সালে প্রার্থীপ্রতি ছয় থেকে সাত লাখ টাকা করে নিয়েছিলেন হারুন মল্লিক। লিখিত পরীক্ষার উত্তর বাইরে থেকে সরবরাহের জন্যে তার প্রার্থীদের ছোট মোবাইল ডিভাইস দিয়েছিলেন। বিষয়টি জানাজানি হলে ক্ষুব্ধ শিক্ষক নেতারা লিখিত পরীক্ষার আগের দিন ঘটনাটি গোপনে জেলা প্রশাসককে জানান। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে লিখিত পরীক্ষার দিন সকাল থেকেই হারুন মল্লিককে নজরদারির মধ্যে রেখে পরীক্ষার হলে বিশেষ অভিযান চালায় প্রশাসন। অভিযানের খবর পেয়ে অনেকেই ডিভাইস ফেলে দেন। তার পরও একজনকে ডিভাইসসহ হাতেনাতে আটক করে একমাসের কারাদণ্ড দেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, নানা অভিযোগে গত ১৩ বছরে পাঁচবার বদলির আদেশ হলেও গাজীপুর ছাড়েননি হারুন মল্লিক। প্রভাব খাটিয়ে প্রতিবার বদলির আদেশ ঠেকিয়ে দিয়েছেন। ২০০১ সালে ১১ জনকে জাল সনদে আনসার-ভিডিপি কোটায় চাকরি পাইয়ে দেওয়ায় অভিযোগ ওঠায় তাঁকে গাজীপুর থেকে বদলি করা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হয়নি। নানা অভিযোগ উঠলেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় না দেখে এখন তাঁর বিরুদ্ধে কেউ মুখ খুলতে চান না।

গাজীপুর প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন কর্মকর্তা বলেন, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তিন বছর পরপর বদলির নিয়ম থাকলেও হারুন মল্লিক যেন সব নিয়মের বাইরে। অনিয়ম করেও তিনি ১৩ বছর ধরে ওই চেয়ার আঁকড়ে বসে আছেন।

তবে হারুন মল্লিক সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমার শ্বশুর মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। স্ত্রী ও শ্যালিকারা মুক্তিযোদ্ধা কোটায় চাকরি পেয়েছেন। অন্যরাও যথাযথ সনদে এবং লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় পাস করেই চাকরি পেয়েছেন। এসব নিয়ে লেখালেখি হলে চাকরিপ্রাপ্তদের অনেককে অযথা হয়রানির শিকার হতে হবে। আমারও বিপদ হতে পারে। তার চেয়ে চলুন আমি-আপনি বসে মীমাংসা করে ফেলি।'

২০০৯ সালের বেতন স্কেল অনুযায়ী সব মিলিয়ে হারুনের বেতন ছিল ১৮ হাজার টাকার কিছু বেশি। বেতনের এ টাকায় এত কিছু কিভাবে সম্ভব—জানতে চাইলে হারুন বলেন, আমরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই চাকরি করি। তা ছাড়া এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নই।

শ্রীপুর উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা হারুনুর রশিদ কালের কণ্ঠকে জানান, প্রতিবার উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাসা বা কারিগরি শিক্ষা বোর্ড থেকে পাস করা প্রার্থীদের অধিক সংখ্যায় নিয়োগের বিষয়টি তাঁরও দৃষ্টিগোচর হয়েছে। তাঁরা কিভাবে নিয়োগ পাচ্ছেন, তা কর্তৃপক্ষ বলতে পারবে। শিক্ষক হিসেবেও তাঁরা ভালো করতে পারছেন না, এমন খবর তাঁর কাছেও আছে। কিন্তু এসব বিষয়ে কখনো কোনো অভিযোগ তিনি পাননি। তাই তদন্ত করেও দেখা হয়নি।

গাজীপুর প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোহাম্মদ মোফাজ্জল হোসেন কালের কণ্ঠকে জানান, নিয়োগে অনিয়মের সুযোগ নেই। আনসার-ভিডিপি সদস্যদের জন্য জেলা আনসার-ভিডিপি কর্মকর্তা, প্রতিবন্ধীদের জন্য জেলা সমাজসেবা বিভাগের উপপরিচালক, এতিমদের জন্য নিবন্ধনকৃত এতিমখানার প্রধান সনদ দেন। কোটায় আবেদন করা প্রার্থীদের এসব সনদ থাকলে চাকরি পেতে কোনো বাধা নেই। এ ক্ষেত্রে দায়-দায়িত্ব সনদ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের।

সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে সনদ যাচাই না করা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মৌখিক পরীক্ষার সময় মূল সনদ দেখা হয়। এ কারণে আর যাচাইয়ের প্রয়োজন নেই।